Netaji Subhas Open University

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

1st Swami Vivekananda Memorial Lecture

2022

স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক বক্তৃতা

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তালোকে মুক্তির ধারণা ও আদর্শ

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ মহারাজ

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তালোকে মুক্তির ধারণা ও আদর্শ

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ মহারাজ

Compiled and Formating by
Dr. Papiya Upadhyay,
Assistant Professor of Education,
School of Education, NSOU
And
Ms. Swapna Deb
Consultant, School of Education, NSOU

Netaji Subhas Open University
DD-26, Sector, Salt Lake City, Kolkata-700064

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তালোকে মুক্তির ধারণা ও আদর্শ
স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ মহারাজ

First Published : January, 2023

Published by
Dr. A.B. Aich, Registrar (Acting)
Netaji Subhas Open University,
DD-26, Sector, Salt Lake City, Kolkata-700064

Printed by
The Saraswati Printing Works
2 Guru Prosad Chowdhury Lane, Kolkata-700006

Professor Ranjan Chakrabarti, Vice-Chancellor
Netaji Subhas Open University
Accredited by NAAC with 'Grade-A'
DD-26, Salt Lake, Sector-I, Kolkata-700064
email : vc_nsou@wbnsou.ac.in
website : www.wbnsou.ac.in

শুভেচ্ছা পত্র

দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের অভিনন্দন জানাই। ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের রাজ্যে উচ্চশিক্ষা বিকাশ ও মুক্তশিক্ষার বৃহত্তর পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিগত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সারা বিশ্বের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত নীরিক্ষার যে আমুল ও পারিকল্পিক বদল ঘটেছিল তার গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে শিক্ষাক্রমের প্রায়োগিক মেলবন্ধন এবং উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রের ব্যাপক বিস্তার। মুক্তশিক্ষাক্রম এই মেলবন্ধনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে এই আলো এসে পৌঁছয় মূলত ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে। ক্রমপ্রসরমান সেই শিক্ষা পরিসরে বিভিন্ন প্রদেশে একে একে গড়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। পশ্চিমবঙ্গে যাত্রা শুরু করে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এক অমর দেশপ্রেমিকের জন্ম-শতবর্ষ উদযাপন বর্ষে।

এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় একটি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক ব্যবস্থার প্রায়োগিক গুরুত্বকে উর্দ্ধে তুলে ধরতে চায়। ঐতিহ্যগত শিক্ষণ-পদ্ধতির সমান্তরালে অনুশীলন করে মুক্ত-শিক্ষাক্রম-যা শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তিকরণের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যকে বৃহত্তর তাৎপর্য প্রদান করে। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে ভারতবর্ষের অন্যতম পরিচিত একটি সরকারী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে উচ্চশিক্ষা স্তরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক গবেষণার সুযোগ রয়েছে। ২০২১ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তশিক্ষা পরিসরে উৎকর্ষের নিরিখে ন্যাক-এ গ্রেডের স্বীকৃতি লাভ করেছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মেলবন্ধনের মাধ্যমেই এই অভিযাত্রায় নিরন্তর উৎকর্ষ অনুসন্ধানের একনিষ্ঠ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ময়কর ও অভিনব উৎকর্ষ যা উচ্চশিক্ষায় বিপুল সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে তাকে সংহত করার প্রচেষ্টা নিয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার্থীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব ভার্চুয়াল 'লার্ণিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' চালু হয়েছে। e-SLM, A/v lectures, SD Card, OER repository, MOOCs ইত্যাদির মাধ্যমে সময়োপযোগী শিক্ষণ-পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রকে আমাদের রাজ্যে অনেকটা

প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে যেমন সুনিশ্চিত হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অন্তর্ভুক্তিকরণ তেমনই সাফল্য পেয়েছে ন্যায়সঙ্গত গুণগত শিক্ষার স্বনির্ভর কার্য্যক্রম।

মুক্তশিক্ষার আঙিনায় গবেষণা, শিক্ষা ও শিক্ষণের প্রতর্ক বিষয়ক নীরিক্ষা ও সেবিষয়ে আলোচনা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নয়। এই মর্মে নিরন্তর আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এমনই একটি আয়োজন মহান দেশনায়ক ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের নামাঙ্কিত স্মারক বক্তৃতাগুলি। এই ধারাবাহিকতায় 'স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক বক্তৃতা'র আয়োজন করা হয়েছিল এবছর। স্কুল অব এডুকেশনের তত্ত্বাবধানে 'প্রথম স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক বক্তৃতা' প্রদানে সাড়া দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ মহারাজ। আমি তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। তাঁর বক্তৃতার শিরোনাম ছিল 'কার্যে পরিণত বেদান্ত' যার মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও মুক্তির বাণীকে স্বামীজীর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতা ও বিশ্লেষণ বেদান্তের বৃহত্তর অর্থ-তাৎপর্য সংশ্লেষণে আমাদের চিন্তাসূত্র দেবে।

আমি ধন্যবাদ জানাই স্কুল অব এডুকেশনের অধিকর্তা ড.অতীন্দ্রনাথ দে সহ সকল শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে যাঁরা এই স্মারক বক্তৃতা সাফল্যের সঙ্গে আয়োজনে যুক্ত ছিলেন এবং বক্তৃতার মুদ্রিত রূপটি যথাযথ পরিকল্পনায় পাঠকের সামনে তুলে ধরতে সাহায্য করলেন। আশা করি বৃহত্তর পাঠকসমাজে এই সুচিন্তিত বক্তৃতাটি সমাদৃত হবে।

ডি.ডি ২৬, সেক্টর ১, সল্টলেক সিটি
কলকাতা -৭০০০ ৬৪
২০ ডিসেম্বর, ২০২২

অধ্যাপক রঞ্জন চক্রবর্তী
উপাচার্য
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তালোকে মুক্তির ধারণা ও আদর্শ

সরাসরি বিষয়ে প্রবেশের পূর্বে কতকগুলি কথা স্বীকার না করলেই নয়। স্বাধীনতার ধারণা বা মুক্তির ধারণা বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করার সময় বর্তমান প্রাবন্ধিকের চিন্তাপ্রবাহ মূলত তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। প্রথমত, চলতি বছরটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ৭৫তম বর্ষপূর্তি; দ্বিতীয়ত, প্রতি বছরের মত এ বছরও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবসকে কেন্দ্র করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে জাতীয় যুবদিবস ও যুবসপ্তাহ উদযাপন এবং তৃতীয়ত, চলতি বছরেই রামকৃষ্ণ মঠ নয়, 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামক সেবামূলক, আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠার ১২৫তম বর্ষপূর্তি। এই ত্রিবিধ প্রবাহের সঙ্গমকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে পাঠক মনে করতে পারেন যে, এই বিষয়গুলিকে একত্রিত করবার অর্থ কী? আদৌ কি এই বিষয়গুলির মধ্যে কোন আন্তঃযোগসূত্র রয়েছে? চিন্তাভাবনা করতে করতে বর্তমান লেখকের মনে হয়েছে, যোগসূত্র রয়েছে। সেই বিষয়েই আলোকপাত করার প্রয়াস লেখক করবেন।

ইতিহাসগতভাবে এ কথা সত্য যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামী যাঁরা, বিশেষত বিংশ শতাব্দীতে যাঁদের আবির্ভাব হয়েছিল, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁরা কমবেশি সকলেই স্বামীজীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সকলেই যে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, এমনটা বলা না গেলেও অধিকাংশই তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। সেই প্রভাব অনেকে স্বীকার করেছেন, আবার কেউ স্বীকার করে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাঁদের কার্যধারা ও আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করলেই প্রভাবের অনাবিল অভিজ্ঞানগুলি বোঝা যাবে। ডঃ লাডলীমোহন রায়চৌধুরী তাঁর 'পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন' শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থে যাবতীয় তথ্য উদ্ধৃতিসহ দেখিয়েছেন কীভাবে বিবেকানন্দ স্বয়ং, বিশেষত বিবেকানন্দের রচনাসমূহ এবং বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশন' পুলিশি সন্দেহের মূল ও ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল। উক্ত গ্রন্থের প্রস্তাবনায় গ্রন্থকার লিখেছেনঃ "ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ইংরাজ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম মূলত ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। ১৮৯৪ সালে মহারাষ্ট্রের গণপতি উৎসব কিংবা বাংলা দেশে কালী মন্দিরে, গীতা হাতে নিয়ে বিপ্লবীদের দেশমাতৃকার নামে শপথ গ্রহণ- এ সবই এ দেশে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধের পরিচয় বহন করে। ইংরাজরা যাঁদের সন্ত্রাসবাদী বলতেন, সেইসকল উগ্রপন্থী বিপ্লবীদের মতাদর্শ ব্যাখা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর 'The Extremist Challenge' বইতে লিখেছেন, "This is the story of an idea at once religious and political" মন্তব্যটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনীতিতে ধর্মের এই অপরিসীম প্রভাব সরকারের চোখ এড়িয়ে যায় নি। তাই এদেশের সন্ন্যাসী সমাজের কোন কোন অংশের উপর তাঁরা বরাবরই

গোপনে গোপনে চোখ রাখতেন। এই গোপন প্রহরা থেকে রামকৃষ্ণ মিশনও অব্যাহতি পায়নি। না পাওয়াটাই স্বাভাবিক কেননা মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ এবং তিনিই আবার এ দেশের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রাণপুরুষ।"[১] প্রথমত, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সূচনালগ্নে স্বামীজীর অন্তর্ধান হলেও, ঐ সময়ে যে উনি ব্রিটিশ সরকারের সুনজরে ছিলেন, এমন বলা যায় না।[২] এক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আবশ্যক। তদানীন্তন কাশ্মীরে স্বামীজীর মনে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্র স্থাপনের অভিপ্রায় দেখা গিয়েছিল। জম্মুতে মহারাজ প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এই প্রস্তাব তাঁর কাছে রেখেছিলেন। এই অভিপ্রায়ের কথা শ্রীনগর থেকে মার্গারেট নোবলকে লিখিত ১লা অক্টোবর, ১৮৯৭-এর চিঠিতে পাইঃ "তোমার কাছে কাশ্মীরের বর্ণনা দেবার চেষ্টাও করব না। শুধু এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে যে, এই ভূস্বর্গ ছাড়া অন্য কোন দেশ ছেড়ে আসতে আমার কখনো মন খারাপ হয়নি। সম্ভব হলে, রাজাকে রাজি করিয়ে এখানে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবারও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।"[৩] কিন্তু প্রতাপ সিংহ তখন ব্রিটিশ রাজরোষের কবলে পড়ার দরুণ কার্যত কিছুই হয়ে ওঠেনি।[৪] এক্ষেত্রে ব্রিটিশ কর্তৃক স্বামীজীর প্রতি আচরিত অনাদর এবং ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে স্মরণে রেখে শ্রীমা সারদাদেবীর তাঁর 'নরেন'কে নিয়ে আশঙ্কার কথা অবশ্য স্মর্তব্য।[৫] দ্বিতীয়ত, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের নিষ্ঠ পাঠকমাত্রই এ কথা জানেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন বহু সন্ন্যাসী পূর্বাশ্রমে প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য সংগত কোন কারণে তাঁরা ত্যাগের পথ অবলম্বন করেন। মূল বক্তব্য এই যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'বিবেকানন্দ' নামক ব্যক্তিত্ব এবং বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামক আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান, এই বিষয়দুটি ভারতবর্ষের তৎকালীন শাসকবর্গের কাছে কোন স্বস্তিদায়ক নির্মাণ হয়ে উঠতে পারেনি।[৬] ঐতিহাসিকেরা যদি এ বিষয়ে না ভাবেন, তবে ইতিহাসের মিথ্যাচার করা হয়। এটি নেতিবাচক দিক থেকে বলা হলেও, একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, ইতিবাচক দিক দিয়ে প্রায় সকলের উপরেই স্বামীজীর প্রভাব পড়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, মহাত্মা গান্ধী, বাল গঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বাঘা যতীন, হেমচন্দ্র ঘোষ, সূর্য সেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ সমকালীন ও পরবর্তীকালীন প্রায় সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবনে এই পরিব্রাজকের প্রভাবের কথা অবিস্মরণীয়। মুক্তি-সংগ্রামীদের নিজেদের কথা ছাড়াও পুলিশি রিপোর্টে এর অজস্র প্রমাণ মেলে।[৭]

স্বামীজীর চিন্তাভাবনায় পরাধীন ভারতবর্ষের 'মূঢ়-ম্লান-মূক' জীবনের চিত্রটি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছিল। একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা আমরা সকলেই অবগত। আমেরিকা যাওয়ার পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র ভারত-পরিক্রমা করলেন; রাজার প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের কুটির পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে ভারতবর্ষের হতদরিদ্র, পরাধীন, পদদলিত অবস্থা স্বচক্ষে দেখলেন। পরিশেষে, ভারতপথিকের চলার আকাঙ্ক্ষা ক্ষণিক

প্রশমিত হলে উপনীত হলেন ভারতমাতার চরণপ্রান্তে, কন্যাকুমারীতে। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন তিনদিকের সম্মিলিত ফেনিলজলরাশির মাঝে এক শিলাখণ্ড। আহারনিদ্রা ভুলে তিনদিন ধ্যানে নিরত থাকলেন ঐ শিলাখণ্ডের উপর। সাকার-নিরাকার কোন দেবতার নয়, ধ্যান করলেন তিনি ভারতবর্ষের। ভারতবর্ষের সমাসীন সমস্যা থেকে নিষ্কৃতির অনুধ্যানে নিবিষ্ট পরিব্রাজকের প্রজ্ঞার আলোকে ভেসে উঠল ভারতবর্ষের অতীত, বর্তমান ও ভাবীকালের স্বপ্নচিত্র। ভারতবাসীর অধঃপতনের কারণ, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দুর্বলতার উৎসসূত্র বিশ্লেষণ করে তিনি ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণের আলোকদিশা নিরূপিত করলেন। ম্যাকলাউডের যথার্থ মন্তব্যঃ "অস্থিমজ্জায় তিনি মানুষের সমস্ত যন্ত্রণা অনুভব করতেন।"[৮] স্বামীজীর চোখের সামনে ফুটে ওঠা সমকালীন ভারতবর্ষের এই যে শোচনীয় অবস্থা, এর থেকে ভারত মুক্তি পাবে কী করে? স্বামীজী উপায় নির্দেশ করে বলেছেনঃ 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।'[৯] অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর নবজাগৃতির প্রাণকেন্দ্র হবে ভারতবর্ষ। যে ভারতবর্ষের বেদনার্তি এই পরিব্রাজককে দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে নিয়ে গিয়েছিল, যার অন্তর্দাহ তাঁর অন্তঃশ্চক্ষুর প্রজ্ঞালোকে উদ্ভাসিত হয়ে ভারতের ভূত-ভবিষ্যতের উপলব্ধি এনে দিয়েছিল, সে-ই ভারতবর্ষ পুনরায় অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দুরপনেয় সমস্যাসকলের সুষম সমাধান করে পুনরায় বিশ্বের দরবারে মঙ্গলময় বার্তা প্রেরণ করবে, এমনটাই স্বামীজীর কথার নিহিতার্থ।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়ে ভারতবর্ষের গৌরবগাথা প্রচার করেছিলেন। তার কারণ সন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখি, আসলে স্বামীজী সকলকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের নিজের যে বিরাট সম্পদ রয়েছে, ব্রিটিশরা তাকে পদদলিত করে রেখেছে। আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ভারতবর্ষে তিনি প্রত্যক্ষ প্রভাব আকারে ছড়িয়ে পড়লেন। বারাণসীতে প্রমদাদাস মিত্রের বাটীতে থাকাকালীন স্বামীজী তাঁকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেনঃ "আবার যখন এখানে ফিরব, তখন আমি সমাজের উপর একটা বোমার মতো ফেটে পড়ব"।[১০] এটি একেবারে সত্য সংঘটনা। আমাদের মুশকিল হচ্ছে, আমরা দেশের 'ম্যাক্রো হিস্ট্রি' বা বৃহদেতিহাস রচনা করি, দেশের 'মাইক্রো হিস্ট্রি' বা অণু ইতিহাস রচনা করলে উক্ত ঘটনার সত্যতা হাতেকলমে প্রমাণিত হবে। প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজী ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পরিভ্রমণকালে তাঁর নিজের বক্তব্য চারিদিকে প্রচার করছেন। ক্রমে তাঁর বক্তব্যকে গ্রহণ করার ঔৎসুক্য জনগণের মধ্যে দেখা দিল এবং তাঁর প্রভাব সংক্রমিত হতে লাগল। তারপর স্বামীজী তাঁর এই কর্মকাণ্ডের ধারা অব্যাহত রাখতে গঠন করলেন 'রামকৃষ্ণ মিশন', যার সদস্যরা তাঁর পরিকল্পনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন। পাশ্চাত্য থেকে প্রথমবার স্বদেশে ফেরার পর মাদ্রাজে কয়েকজন যুবক স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেনঃ "আচ্ছা স্বামীজী, আপনি রাজনীতিতে আসছেন না কেন? রাজনীতিতে এসে দেশকে স্বাধীন করার চেষ্টা করছেন না কেন?" প্রত্যুত্তরে স্বামীজী

বলেনঃ "আমি কালই তোমাদের স্বাধীনতা এনে দিতে পারি; কিন্তু তোমরা কে তা রাখতে পারবে? মানুষ কোথায়? আগে মানুষ তৈরি হোক। তারপর স্বাধীনতা আপনি আসবে।"[১১] এক্ষেত্রে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে স্বামীজীর বলা কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্যঃ "ভাই, সকলের আগে মানুষ চাই। সত্যিকারের মানুষ। মানুষ না হলে কিছু হবে না। স্বাধীনতা পাঁচ বছর পরে আসবে, কি বিশ বছর পরে আসবে, কি পঞ্চাশ বছর পরে আসবে সেটা বড় কথা নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথা স্বাধীনতা অর্জন করার যোগ্য আমরা হয়েছি কিনা, আরও বড় কথা স্বাধীনতা পেয়ে তা বজায় রাখতে পারব কিনা।" স্বামীজী সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন 'man-making'-এর উপর। স্বামীজীর মূল বক্তব্য ছিল, ভিত যদি ঠিকঠাক তৈরি না হয়, তবে তার উপর প্রাসাদ নির্মাণ অসম্ভব। স্বামীজী আশিষ্ট, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও মেধাবী- এই চতুর্গুণসম্পন্ন ব্যক্তি-মানুষ তৈরির কথা বলেছিলেন। স্বামীজী ব্যক্তি-মানুষের যে অবশ্য স্মরণীয় ত্রিবিধ বিশিষ্টতার উল্লেখ করেছেন, তা যথাক্রমেঃ প্রথমত, সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস; দ্বিতীয়ত, হিংসা ও যাবতীয় সন্দিগ্ধ ভাবসমূহের একান্ত অভাব; তৃতীয়ত, যারা ভালো হতে কিংবা ভালো কাজ করতে সচেষ্ট, তাদের সহায়তা করা। এই বিশিষ্টতাগুলিকে অবলম্বন করে জাতি বা ব্যক্তি-মানুষ নিজেদের গঠিত করতে পারলে স্বাধীনতা আসবে এবং সকলে স্বাধীনতার যথার্থ আস্বাদ গ্রহণে সক্ষম হবে। বিবেকানন্দ সবিশ্বাসে বলেছিলেন ঃ "আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই।"[১২] ভারতবাসীর মনে ভারতীয়ত্বের চেতনা জাগ্রত করবার জন্য তিনি বলেছিলেনঃ "ভুলিও না- নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল- আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল- মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই;"[১৩] এখন প্রশ্ন হল, স্বামীজীর এই কথায় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এত প্রাণিত হল কীভাবে? বিভিন্ন সমালোচকের মন্তব্যে বিবেকানন্দ 'হিন্দু সন্ন্যাসী', 'হিন্দু পুনরুত্থানবাদের অন্যতম নেতা' প্রভৃতি শব্দবন্ধ উঠে আসলেও বিবেকানন্দের মূল 'পয়েন্ট' ছিল ভারতীয়ত্ব। নিঃসন্দেহে তিনি একজন হিন্দু সন্ন্যাসী এবং সেই পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেছেন সর্বত্র। শিকাগো মহাধর্মসম্মেলনে তাঁর স্পষ্ট ঘোষণাঃ "আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী 'এক্সক্লুশন' শব্দটি অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া গর্ব অনুভব করি।"[১৪] বিবেকানন্দ ঘোষণা করলেন সনাতন ভারতীয় ধর্মের পারস্পরিক ভাবগ্রহণের (acceptance) ব্যাপারটি। সকলকে স্বীকার করে নেওয়ার সাধনা, এই সাধনাই বিশ্বের ক্রমমুক্তির, ক্রমোন্নতির একমাত্র সাধনা। হিন্দু সন্ন্যাসীর ভারতীয়ত্বের এই চেতনা আসলে 'বসুধৈব কুটুম্বকম-সঞ্জাত। বসুধাকে

আপনার করে নেওয়ার এই সাধনা যাবতীয় সংকীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের আলোকশুভ্র পথ। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন ঃ

আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।[১৫]

এটি পরবর্তীকালের রচনা হলেও পূর্বেই স্বামীজী এই ভাবটিকে তাঁর চিন্তা ও কার্যধারার সঙ্গে সর্বতোভাবে মিশিয়ে ফেলেছিলেন। প্রশ্ন জাগে, স্বামী বিবেকানন্দের এই অগ্নিবর্ষী জীবন ও কথার দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিপুলাংশ প্রভাবিত হলেন কেন? কারণ হিসেবে বলা যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামের এই যে প্রায় অর্ধশতাব্দী (১৯০০-১৯৪৭), এই সময়ে ভারতবর্ষে একাধারে আবির্ভূত হয়েছিল সশস্ত্র সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ, অন্যধারে গণঅভ্যুত্থান। সমসময়ে বিভিন্ন ধরণের আন্দোলন সংঘটিত হলেও পূর্বোক্ত আন্দোলন দুটির মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য বর্তমান। যে কোন ধরণের দেশ-জাগানিয়া আন্দোলন বা স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে যাঁরা আন্দোলনকারী, তাঁদের কেবল হাতের অস্ত্র বা ম্যানিফেস্টোর প্রয়োজন ছাড়াও, প্রয়োজন প্রচণ্ড, দুর্নিবার মানসিক শক্তির। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যাঁরা স্বাধীনতার আন্দোলনে, দেশমুক্তির আন্দোলনে এগিয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককেই নিজস্ব দেহ-মনকেন্দ্রিক চাহিদাগুলিকে অগ্রাহ্য করে মনের মধ্যে এক দুর্বার শক্তিকে লালন করতেই হয়েছে; পরিবার-পরিজন ও দৈহিক যাবতীয় পিছুটানকে ভুলে যেতে হয়েছে। কারণ, নিজেদের দেহকেন্দ্রিকতা আসলে নিজস্ব স্বাধীনতাকেই খর্ব করে তোলে। কিন্তু দেশের শোষণমুক্তির, মাতৃভূমির মুক্তিকামী সংগ্রামীদের অভীষ্ট পূরণের উদ্দেশ্যে সমস্ত পশ্চাদপসারণ বিস্মৃত হয়ে মনের শক্তিকে কেন্দ্রীকরণের বিষয়ে সচেতন হতে হয়েছে। যেকোন দেশেরই স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্টতা এখানেই যে, সংগ্রামীরা নিজেদেরকে মুক্তির এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে ফেলেন, যেখানে আত্মবিস্মৃত সংগ্রামী-সন্তানের হৃদয়ে মাতৃভূমির মুক্তিতৃষ্ণা সতত জাগরুক। স্বামীজীর কথায়ঃ "কদিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস, তখন একটা দাগ রেখে যা নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? মুক্তিকামনাও তো মহা স্বার্থপরতা। ফেলে দে ধ্যান, ফেলে দে মুক্তি-ফুক্তি। একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই; তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই মরা ভাল।"[১৬] এ বার্তা শোনার পর মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ৪৫ সংখ্যক (পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি) কবিতাটি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধুলা সেই তোর ধাত্রী;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি
ধরার বন্ধন হতে নিয়ে যাক হরি
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।
ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে,

নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ,
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।[১৭]

উনবিংশ শতাব্দীর সংঘাতমুখর পরিবেশে বিবেকানন্দের জবানীতে এই 'রুদ্রের প্রসাদ'-আহ্বান শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সংগ্রামীরা। দেশের শোষণমুক্তির আন্দোলনে অবতরণের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রাপ্ত 'Freedom'-এর একটা উদারতর 'কনসেপ্ট' তাঁদের কাছে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল, যা তাঁদেরকে যাবতীয় ক্ষুদ্র বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে অনিরুদ্ধ সাহস জুগিয়েছিল। লন্ডনে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেনঃ "you must remember that freedom is the first condition of growth. What you do not make free, will never grow The idea that you can make others grow and help their growth– that you can direct and guide them, always retaining for yourself the freedom of the teacher, is nonsense, a dangerous lie which has retarded the growth of millions and millions of human beings in this world. Let men have the light of liberty, that is the only condition of growth".[১৮] আমাদের অফুরন্ত চাওয়ার কেন্দ্রে থাকা 'আমি'র সন্তুষ্টিবিধান এককালে অসম্ভব। এই নিরর্থক সন্তুষ্টিবিধানে কেবল অতৃপ্তিবোধের (dissatifaction) উদ্ভব হয়। আমাদের 'আমি'র ক্ষুদ্র সীমানা ছাড়িয়ে যদি চাওয়াগুলিকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারি, তবে কোন চাওয়া-ই আমাদের আর প্রভাবিত করতে পারবে না। তবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাওয়ার মধ্যে দিয়েই অর্থীকে বৃহত্তর চাওয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হতে হবে, যার পরে আর কিছু চাওয়ার অবশিষ্ট থাকে না। 'আমার শরীর, আমার মন'- এই সকল ভাবনাকে কেন্দ্র করে রচিত সংকীর্ণ বৃত্তকে ক্রমে 'আমার দেশ, আমার সমাজ'-কেন্দ্রিক বৃহত্তর ভাবনাসমূহ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করলে আমরা আসলে সীমাবদ্ধ কূপমণ্ডূকতা ছাড়িয়ে উঠে যাই বিশ্বের প্রসারিত দরবারে। সুতরাং, জাতীয় মুক্তির কথা যাঁরা চিন্তা করবেন, তাঁদের অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানবমুক্তির ধারণা স্মরণে রাখতে হবে এবং দেখতে হবে যাতে নিজের জাতিকে মুক্ত করতে গিয়ে অন্য জাতি না অধীন হয়ে পড়ে। তাহলে মুক্তির প্রকৃত নির্মাণ সম্ভব হবে না। আন্তর্রাষ্ট্রিক সংঘাতকে প্রশ্রয় দিয়ে কখনই কোন মুক্তি আসতে পারে না। স্বামীজী তাই বলেছেন যে, সেই 'ultimate freedom'-এ পৌঁছতে গেলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীলতা বজায় রেখে এবং সমস্ত অন্তর্দন্দ্ব ব্যতিরেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাপে এগোতে হবে। স্বামীজী বলেছেনঃ "মুক্তস্বভাবের

অর্থ— বাহ্য সকল বস্তুর অধীনতা হইতে মুক্ত। অর্থাৎ বাহিরের কোন বস্তুই উহার উপর কারণরূপে কোন কার্য করিতে পারে না।"[১৯] যখনই আমরা আত্মমুক্তির বা বৃহদর্থে বিশ্বমুক্তির কথা ভাবব, তখন আমাদের দৈহিক ও মানসিক যাবতীয় চাহিদাগুলিকে অতিক্রম করে যাওয়ার সাধনাকে স্বীকার করতে হবে। ফলস্বরূপ, মনের মধ্যে এমন এক দুর্নিবার শক্তি সঞ্চারিত হবে, যার মাধ্যমে যেকোন ধরণের অনায়াসসাধ্য, দুরূহ কর্মজাল ছিন্ন করে সম্মুখে এগিয়ে যেতে পারব। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বিবেকানন্দের এই ভাবনাকেই আত্মস্থ করে দেশমুক্তির বিভিন্ন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যাঁরা জাতীয় মুক্তির বৃহত্তর যজ্ঞশালার হোমশিখাটি প্রজ্বলিত করেছিলেন এবং নিবেদিত প্রাণে সে হোমশিখাকে সপ্রভ রাখার অব্যর্থ প্রয়াস করেছিলেন, তাঁদের এ পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না; সাধারণের অনাচরিত সে পথ উপলবন্ধুর।

স্বাধীনতা-মুক্তিকামী সংগ্রামীরা এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন নির্ভীকচিত্তে। ইতিহাস তাঁদের স্মরণে রাখল, কি বিস্মৃত হল, তার কোন পরোয়াই তাঁরা করেন নি; তাঁরা শুধু জানতেন যে, তাঁরা 'মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত'[২০]— দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের উদ্দেশ্যে বলিপ্রদানে উন্মুখ প্রাণ। এরকম চরম আত্মত্যাগের বিষয়ে চিন্তা করলে মনে হয়, তাঁরা এই ভাবটি গ্রহণ করলেন কীভাবে? বুঝতে বিলম্ব হয় না, স্বামীজী প্রদত্ত 'Freedom'-এর উদারতর 'কনসেপ্ট' এঁদের শোণিতে শোণিতে বিদ্যুৎ-সঞ্চার করেছিল, সকলপ্রকার পশ্চাদপদতা ভুলে, নিজের রচিত ক্ষুদ্র বৃত্তকে অতিক্রম করে ক্রমে তার বৃহত্তর পরিধিতে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছিল। যে পতঙ্গ-আহ্বান বিবেকানন্দের 'Concept of Freedom'-এর অক্ষরে অক্ষরে, রবীন্দ্রনাথের 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাতেও সেই একই আহ্বান প্রতিধ্বনিত হয়েছেঃ

বাহিরিয়া এল কা'রা? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জনমাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল;
'যাত্রা করো, যাত্রীদল'
উঠেছে আদেশ,
'বন্দরের কাল হল শেষ।'[২১]

বিবেকানন্দের 'Concept of Freedom', 'Spiritual Approach'-ভিত্তিক হলেও তা সংগ্রামীদের নিদারুণ প্রভাবিত করেছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল দেশ পরাধীনতার আগল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তাদের প্রত্যেকেই কালক্রমে রাষ্ট্রনৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছে। কিন্তু অর্জন করেও সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করতে

পারেনি। কারণ হিসেবে বলা যায়, আদর্শের দিক থেকে অর্থাৎ আদর্শ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের দিক থেকে তাঁদের অনেক ত্রুটি থেকে গেছে। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষকেও আদর্শ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। স্বামীজী তাঁর আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতবর্ষের মূল আদর্শ বা ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা, যার ওতপ্রোত দুই অনুভাব ত্যাগ ও সেবা। যদিও 'আধ্যাত্মিকতা' শব্দটির প্রতি অনেকেই উন্নাসিক, তবুও স্বামীজী তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন থেকে আধ্যাত্মিকতার ঔপনিষদিক বা বৈদান্তিক 'Inclusive Idea'-কে সর্বসমক্ষে নিয়ে এসেছিলেন। ভারতের বেদান্ত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ঘোষণা করেছেন- 'আত্মানাং বিদ্ধি'- নিজেকে জান, 'তত্ত্বমসি'- তুমিই সেই। সুতরাং বেদান্ত চরম ও পরম লক্ষ্যকে স্থির করতে বলছেন অর্থে এই নয় যে, তিনি অন্যান্য খণ্ড লক্ষ্যগুলিকে বিসর্জন দিতে বলছেন; একটি প্রধান লক্ষ্য স্থির করার পর বিবিধ খণ্ড খণ্ড লক্ষ্যের মধ্য দিয়ে সেই মূল লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হতে উপদেশ দিচ্ছেন বেদান্ত। যেহেতু 'ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম[২২], সেহেতু আধ্যাত্মিকতার আনন্দ উপভোগ করার উপদেশ দিয়ে অন্যান্য ক্ষুদ্র জাগতিক আনন্দগুলিকে এড়িয়ে যেতে বলছেন নির্দেশ দিচ্ছেন না। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলছেন ঃ "এষোস্য পরম আনন্দ এতসৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।।"[২৩] অর্থাৎ সেই পরমানন্দের কণিকামাত্রই আমরা সংসারের যাবতীয় আনন্দে উপভোগ করি। ঔপনিষদিক আখ্যানে আমরা দেখি, ব্রহ্মবিদ্যাচর্চা করতে যাওয়ার পূর্বে সত্যার্থীর অন্যান্য বিদ্যাচর্চার কথা। তার কারণ, এই দুইয়ের মধ্যে কোনও আন্তর্বিরোধ নেই। আধ্যাত্মিকতা সমস্ত বিষয়েই প্রবিষ্ট হয়ে আছে। মূল লক্ষ্য, আমি দেহ-মন-অতীত এক পরম অস্তিত্ব— এর উপলব্ধি। এটা জানার সুবিধা এই যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সকল অবাঞ্ছিত বিবাদের মধ্যে আমরা জড়িয়ে পড়ি, তার সহজ-সমাধান। যখন আমাদের এই উপলব্ধি হবে যে, আমার মূল সত্তা আসলে যে বিশুদ্ধ চৈতন্য, সেই চৈতন্যসত্তাই জগতে সকলের মধ্যে বর্তমান, তাহলে কারোর প্রতি কোন বিদ্বেষ জন্মাবে কীভাবে? বেদান্ত সমত্বের এই আকর্ষণীয় তত্ত্বটি সকলকে জানিয়েছেন। কিন্তু 'এহো বাহ্য', এ যাত্রা বহুদূরের। জাগতিক বিষয়সমূহকে অতিক্রম করতে পারলে তবেই মুক্তির আসল অর্থ প্রতিপাদিত হবে। কথামৃতে শ্রী রামকৃষ্ণদেবের বলা এক কাঠুরের গল্প আছে, 'চরৈবেতি' বা এগিয়ে চলার গল্প। কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গিয়ে এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে বললেন- ওহে এগিয়ে পড়ো। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে কাঠুরে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে পেল চন্দনের কাঠ, আরও এগিয়ে গিয়ে পেল রূপোর খনি। ব্রহ্মচারীর কথা স্মরণে রেখে না থেমে সে আরও এগিয়ে গেল। ক্রমে সে পেল সোনার খনি, স্তূপীকৃত মণি-মাণিক্য। তখন তার কুবেরের মত ঐশ্বর্য হল। বৈদিক সুক্তের সেই চিরপরিচিত বাণীঃ

চরণ বৈ মধু বিন্দন্তি চরণ স্বাদুমৃদুস্বরম্
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরণ।
চরৈবেতি চরৈবেতি।[২৪]

উপলব্ধিবান পুরুষেরা বলেছেন ঃ 'চর-এব-ইতি'— অর্থাৎ এগিয়ে চল, এই এগিয়ে চলার মাধ্যমেই তুমি অভীষ্ট লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হবে। এগিয়ে চলার অর্থ 'Progression'। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, শতদল কোরকের একটি করে দল ফোটাতে ফোটাতে যেমন কোরকটির সম্পূর্ণ প্রস্ফুটন সম্ভব হয়, ঠিক তেমনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্ধন অতিক্রমণের মধ্যে দিয়েই মানুষ মুক্তির সম্পূর্ণ আস্বাদনে সক্ষম হয়। স্বামীজী এই কথাটিই বারবার বোঝাতে চেয়েছেন যে, ভারতীয়ত্বের মূল নিহিত যে আধ্যাত্মিকতার আদর্শ ও চেতনায়, সেই আধ্যাত্মিকতার আদর্শ নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। দেহ-মন-ব্যতিরিক্ত হওয়ার এই সাধনায় নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে কাজ করলে, শ্রীভগবানের ভাষায় তা 'সাধনা' নয়, ঠিক যেন চৌর্যবৃত্তি।[২৫] স্বামীজী কর্মযোগ-সম্বন্ধীয় বক্তৃতামালায় বলেছেনঃ "Unselfishness is God"। নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির মধ্যে কোন ঈশ্বরত্ব নেই; যখন নিজের স্বার্থচিন্তাকে অপরের কল্যাণকামনায় রূপান্তরিত করতে পারব, তখনই 'মুক্তি'র প্রকৃত ধারণাকে হৃদয়ঙ্গম করা হবে। নিজের দেহ-মন-ব্যতিরেকে অপরের কল্যাণচিন্তা মূলত ত্যাগের আদর্শের বৃহদর্থে সেবার আদর্শে রূপায়ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেনঃ "জীবে দয়া নয়, দয়া করবার তুই কে, শিবজ্ঞানে জীবসেবা।" নরেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেনঃ "কি অদ্ভুত আলো আজ ঠাকুরের কথায় দেখতে পেলাম। ভগবান যদি কখনও কোনো দিন দেন তো আজ যা শুনলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসারের সর্বত্র প্রচার করব।" অতীতে যে বেদান্তচর্চা অরণ্য, গুহায় সীমাবদ্ধ ছিল, স্বামীজী তাকে নিয়ে এলেন সর্বসম্মুখে, নাম দিলেন "Practical Vedanta"—'কার্যে পরিণত বেদান্ত'। ফলিত বেদান্তের মুক্তির বা স্বাধীনতার এই ধারণাকে আয়ত্ত করে যদি ব্যক্তি-মানুষ বা রাষ্ট্র এগোতে পারে, তাহলে সে ক্রমে আত্মকেন্দ্রিকতা ভুলে সমগ্রতার নিকোনো অঙ্গনে গিয়ে উঠবে; তখন সে বুঝবে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার মূল সূত্র একত্বে, সমগ্রতায়— 'একং সদ্বিপ্রাবহুধাবদন্তি'। বহুর মধ্যে থেকে সেই এক, অখণ্ডের উপলব্ধি জাতি-ধর্ম-বর্ণ- শিক্ষা-পেশা নির্বিশেষে সকলেরই কর্তব্য। স্বাধীনতার এই আদর্শের সঠিক ধারণা ও বোধ নিয়েই এগিয়েছিলেন সংগ্রামী অভিযাত্রিকের দল। নিজেদের দৈহিক-মানসিক চাহিদাসকল বিস্মৃত হয়েছিলেন বলেই পুলিশি লাঠিচার্জ, সেলুলার জেলের পাশবিক-যাপন, ফাঁসির যূপকাষ্ঠের নিষ্ঠুর আলিঙ্গনকে অবিচলিতভাবে বরণ করে নিয়েছিলেন। একই আদর্শ যদি আমরাও অবলম্বন করি, তাহলে আমরাও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আদর্শ মানুষ হয়ে উঠতে পারব। স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষের পূর্তিলগ্নে স্বামীজীর কাছে আমাদের প্রার্থনা, যে প্রচেষ্টা বরণীয়রা করে গেছেন, ভারতের জাতীয় আদর্শকে

স্মরণে রেখে আমরাও যেন স্বাধীনতার এই ধারণাকে জীবনের অঙ্গীভূত করতে পারি; একমাত্র তবেই স্বামীজী কথিত —'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ' বাণীর পূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব হবে, জাতীয় মুক্তির আন্দোলন আন্তর্জাতিক মুক্তি আন্দোলনে রূপান্তরিত হবে, মুক্তির সর্বোচ্চ নির্মাণ সম্ভবপর হবে।

তথ্যসূত্রঃ

১। পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন (১৮৯৭-১৯১৭), লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, ঋদ্ধি-ইণ্ডিয়া, প্রথম প্রকাশঃ ৩১শে আগস্ট, ১৯৮৩, পৃষ্ঠাঃ ৯।

২। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১৪। দ্রঃ ভূমিকায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ লিখেছেনঃ "যে কারণেই হোক মঠ-মিশনকে ব্রিটিশ পুলিশ কখনই ভালো চোখে দেখেনি। খানিকটা স্বামীজীর জন্যে, আর খানিকটা বহু সন্ত্রাসবাদী তরুণ ও যুবক সন্ন্যাস নিয়ে মঠে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে। মঠে এসে তাঁরা আর রাজনীতি করতেন না, কিন্তু পুলিশ তা বিশ্বাস করত না। বিশ্বাস করত না বৃটিশ সরকারের শীর্ষ স্থানীয় কর্তৃপক্ষও। ১৯১৬ সালে লর্ড কার্মাইকেল তাঁর দরবার ভাষণে রামকৃষ্ণ মিশনকে সন্ত্রাসবাদীদের আড্ডা বলে বর্ণনা করেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি এ মত প্রকাশের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।"

৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৮ম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কার্ত্তিক ১৪২৮, পৃষ্ঠাঃ ১ (৩৭৫ নং পত্র)।

৪। যুগনায়ক বিবেকানন্দ (৩য় খণ্ড), স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ভাদ্র ১৪২৭, পৃষ্ঠাঃ ৩৪।

৫। শ্রীমা সারদা দেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৮৪, পৃষ্ঠাঃ ২৮০। দ্রঃ 'ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি কি আজ তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত।'

৬। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ষষ্ঠ খণ্ড), শঙ্করীপ্রসাদ বসু, মণ্ডল বুক হাউস, ফেব্রুয়ারি ২০১৬- গ্রন্থের 'রামকৃষ্ণ মিশন ও বিপ্লব আন্দোলন' শীর্ষক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৭। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, সম্পাদনাঃ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক), আশ্বিন ১৩৯৫- গ্রন্থের অধ্যাপক জীবন মুখোপাধ্যায় রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠাঃ ২৭৪।

৮। ভারতবর্ষ (দিনপঞ্জী) (অনুবাদকঃ অবন্তীকুমার সান্যাল)— রোমা রোঁলা, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃষ্ঠাঃ ১৯৩। দ্রঃ তথ্যটি স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত 'বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের স্বামী প্রভানন্দ লিখিত 'বিবেকানন্দ-মশালের রক্তরশ্মি' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত হয়েছে (পৃষ্ঠাঃ ৩৫৮)।

৯। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কার্ত্তিক ১৪২৮, পৃষ্ঠাঃ ২৫।

১০। যুগনায়ক বিবেকানন্দ (১মখণ্ড), স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ভাদ্র ১৪২৭, পৃষ্ঠাঃ ২২৮।

১১। The Complete Works of Swami Vivekanda, Vol 5, Advaita Ashrama, Calcutta, Eighth Edition, 1964, Pg. 333.

১২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৫ম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কার্ত্তিক ১৪২৮, পৃষ্ঠাঃ ১৫৩।

১৩। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১৯৪।

১৪। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ৭।

১৫। গীতালী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, শ্রাবণ ১৩৫৩, পৃষ্ঠাঃ ৮৫।

১৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৯ম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কার্ত্তিক ১৪২৮, পৃষ্ঠাঃ ৮৫-৮৬।

১৭। কবিতাসমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দ পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১০, পৃষ্ঠাঃ ৫৫-৫৬।

১৮। The Complete Works of Swami Vivekanda, Vol.2, Advaita Ashrama, Calcutta, 14th Edition, April 1958, Pg.115.

১৯। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (১ম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কার্ত্তিক ১৪২৮, পৃষ্ঠাঃ ১৬১।

২০। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কার্ত্তিক ১৪২৮, পৃষ্ঠাঃ ১৯৪।

২১। কবিতাসমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দ পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১০, পৃষ্ঠাঃ ৪৫-৪৬।

২২। মুণ্ডকোপনিষদ, স্বামী ভূতেশানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ফাল্গুন ১৪২৭, পৃষ্ঠাঃ ১, (১।১।১)।

২৩। উপনিষদ গ্রন্থাবলী (তৃতীয় খণ্ড), স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কার্ত্তিক ১৪২৮, চতুর্থ অধ্যায়—তৃতীয় ব্রাহ্মণ, ৩২ নং শ্লোক (৪।৩।৩২)।

২৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭।১৫।

২৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ২০১৮, পৃষ্ঠাঃ ৪৪ (তৃতীয় অধ্যায়ের ১২ নম্বর শ্লোক)।

About the Speaker :

Swami (Dr.) Sastrajnananda, was the Former Principal, of Ramakrishna Mission Residential College, Narendrapur Kolkata. Swamiji is presently the Secretary of the Ramakrishna Vidyamandira. He is also the Secretary of Ramakrishna Mission Saradapith of which Vidyamandira is a unit. He is also a monastic Member. Swamiji is illustriously acquainted with scholarly activities in the discipline of Sanskrit, Bengali, Philosophy, and Indology. His proverbial skills and mastery over Divyatrayee (Sri Ramakrishna, Mata Saradadevi & Swami Vivekananda) are unparalleled.

Published by : The Registrar, Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700 064 &
Printed by : The Saraswati Printing Works, 2, Guru Prosad Chowdhury Lane, Kolkata 700 006